সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত : অক্ষয় তূনীর তব

আশিস্ কুমার দে

প্রেসিডেন্সীতে বাংলার ছাত্র (১৯৬৫-৬৭) হয়েও সুবোধ চন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কলেজ লাইব্রেরী থেকে নেওয়া ইংরেজিতে লেখা 'The Art of Bernard Shaw' পড়ে। এছাড়া শেক্সপীয়র নিয়ে ওনার চর্চা ছিল অসামান্য। শ্রদ্ধেয় তারকনাথ সেনের Three Essays on Shakespeare'-এর একটি বিশাল ভূমিকাও লিখেছিলেন তিনি। আজ সত্তরোত্তীর্ণ বয়সে ওনার ইংরেজি ভাষায় দখল ও প্রাতুলতা ভুলতে পারি নি। হয়তো কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে বলে সম্পাদক জানালেন ওনার ইংরেজি সমালোচনা নিয়ে নীরব থাকতে হবে। তাই চোখের সামনে থাকা প্রায় নটি বই যা সুবোধচন্দ্রের, কখনও যুগ্মভাবে রচিত (বাংলায় লেখা) আলোচনা করা হবে।

এখানে সুবোধচন্দ্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন করছি এমন ভাবছিনা। বরং কালানুযায়ী তাঁর সমালোচনা বাংলাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে, কিভাবে তিনি চিন্তার সূচীমুখে সমস্যার অবিলতাকে বিদ্ধ করেছেন, সেটাই আমাদের আলোচ্য। এর মধ্যে থেকে সংবেদী পাঠক সমালোচকসত্তার পরিচয় পাবেন আর জানবেন ইংরেজির প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপকের বাংলা সংস্কৃতির প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণের কথামালা গাঁথা।

আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে (ষাটের দশকের মাঝামাঝি) তাঁর 'শরৎচন্দ্র সমালোচনা সাহিত্য' পুনর্মুদ্রিত (১৩৮১ সাল) প্রথমে আলোচনার জন্য নির্বাচিত করেছি। এর ভূমিকাতে লেখক বলেছিলেন—

১. এর পঞ্চাশ বছর আগে (বিশ শতকের প্রথম দশকে) 'বেণু' পত্রিকায় তিনি 'শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা' প্রবন্ধটি লেখার পর শরৎচন্দ্র নিজে খুশি হয়েছিলেন। এরপর বেশ কিছু শরৎ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাদের একত্র করে বারবার ছাপা হয়। দুটি বই সুবোধচন্দ্র লিখেছিলেন একটি ইংরেজিতে, অন্যটি বাংলায়। প্রথম বইটি ভারতীয় নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিয়ে নানা প্রশ্নের সমাধানের জন্য দ্বিতীয় বাংলা গ্রন্থ লিখলেন।

২. বর্তমান কালে শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গিকতা তার কাছে বড়ো ছিল। কেননা শরৎচন্দ্র নাকি সাহিত্যের জগৎ থেকে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। একালের সমাজ তাঁর রচনায় নেই। পাঠক তাই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নিরুৎসুক। সুবোধচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর রচনা পড়বার ও কিনবার আগ্রহ কমে নি।

৩. যৌথ পরিবার ভেঙেছে হরিশ-রমেশরা হারিয়ে গেছে। পথেরদাবীর সব্যসাচীর প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। তাই লেখকের ৫৩ বছরের জন্মদিনে তিনি বলেছিলেন, তার লেখা কিছু দিন পরে বাসি হয়ে যাবে কেননা সাহিত্যে নিত্যবন্ধু (permanent) বলে কিছু নেই।

৪. তবু শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রাণ আছে। তার চরিত্রেরা ব্যক্তিত্বের বলে এখনও কথা বলে। 'মনুষ্য হৃদয়ের গুহাস্থিত ব্যক্তিসত্তাকে' তিনি প্রকাশ করেছেন। আটপৌরে জীবনের মধ্যে রহস্যজাল বুনেছেন। বৈকুণ্ঠের উইলের প্রসঙ্গ তুললেন একই সঙ্গে শেক্সপীয়রের কিংলীয়রের গনেরিল ও রিগ্যানের সন্ধান সমালোচক পেলেন। শরৎসাহিত্যকে কালজয়ী সাহিত্যের লক্ষণে চিহ্নিত করলেন।

বইটি পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ (২) শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা (৩) শরৎসাহিত্যে নারী : রমণীর প্রেম (৪) শরৎসাহিত্যে নারী : জননীর স্নেহ (৫) শরৎ-সাহিত্যে পুরুষ (৬) শরৎসাহিত্যে শিশু : ইন্দ্রনাথ (৭) সমস্যার সন্ধানে : পথের দাবী : শেষ প্রশ্ন (৮) ছোটগল্প (৯) নাটক (১) শরৎ-সাহিত্যে নীতি (১১) শরৎসাহিত্যে হাস্যরস (১২) গঠনকৌশল (১৩) রচনারীতি (১৪) সাহিত্য-বিষয়ে শরৎচন্দ্র (১৫) শেষের পরিচয়।

এই বইটি ১৯৩ পৃষ্ঠার বলে এর সামগ্রিক মূল্যায়ন আমরা করছি না। কেননা সুবোধচন্দ্রের অন্যান্য বইয়েরা এখানে স্থান পেতে উন্মুখ। তাই শরৎ বা শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে তার বিভিন্ন সূক্তিবচন এখানে থেকে সাজিয়ে দিলাম যাতে পুনর্বিচারে আগ্রহী পাঠক মানসিক রসদ খুঁজে পেতে পারেন :

১. বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে বিরাট শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন, যেন ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

২. রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে সংস্কারমুক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারই পূর্ণতর বিকাশ শরৎ-সাহিত্যে।

৩. বিশ শতকের প্রথম দিকে য়ুরোপীয় সাহিত্য জীবনের সব দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, কখনও সমাধান চেয়েছে। এই জীবন নিয়ে প্রশ্ন-সমাধানধারণা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সবচেয়ে প্রযোজ্য। পর্যবেক্ষণের নিবিড়তা, বিশেষণের অনুপুঙ্খতা, বর্ণনার বাস্তবতায় তিনি 'গুরু' রবীন্দ্রনাথের রীতিই নিয়েছেন। কিন্তু তার মৌলিকতা হল প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শেষ প্রশ্নের উত্তর তার কাছে নেই। কিন্তু সমাজ যে বিধিনিষেধের তর্জনী দেখায়, তা কোন শক্তিতে?

৪. সমাজনিন্দিত পাপ নিয়ে তাঁর কোনো সংকোচ ছিল না। বিধবার সূতিকারোগ, শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা খুব সাধারণ লোক; কিন্তু তাদের জীবনের অন্তর্লীন হয়ে থাকা মানসিকতায় তিনি প্রবেশকামী ছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল—ধর্ম মানুষের প্রতি অবিচারের ফল, তার মূল্য আমরা দেব কেন?

৫. 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গঠনকৌশলের দিক দিয়া এই উপন্যাস অদ্বিতীয়। কাহিনীর আরম্ভ পরিণতি ও পরিসমাপ্তির মধ্যে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, কোথাও একটি ঘটনা অনাবশ্যকভাবে বড় ... কোন অংশ হঠাৎ খণ্ডিত হইয়া পড়ে নাই। ... সকল খণ্ডচিত্রই হইয়াছে একটি বৃহত্তর ঐক্যের অংশমাত্র।'

৬. শরৎ উপন্যাসে আখ্যায়িকা নানানভাবে গড়ে উঠেছে। কোথাও একটি কাহিনী, নায়কনায়িকার অবস্থা, সংকটের সূত্রপাত ; মধ্যভাগে জটিলতা ও দ্বন্দ্ব এবং একটি ঘটনার জটিলতা চরম রূপ ধারণ করে। কখনও দুটি বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত ঘটনা থাকে, একটি মধ্যভাগে আরেকটি পরিণতিতে নিরসন হয়। শ্রীকান্ত উপন্যাসের স্রষ্টার অলক্ষে রচনারীতি পালটেছে। প্রথম পর্বে এটি ভ্রমণকাহিনী দ্বিতীয় পর্বের প্রথমার্ধও ভ্রমণকাহিনী। তৃতীয় পর্বে পৌঁছে এটি উপন্যাস। এটি প্রথম পর্বের চেয়ে নিকৃষ্ট হয় (যেমন মহামতিরা মনে করেছেন) বরং অন্য জাতীয় রচনা বললে ভাল হয়।

৭. শরৎচন্দ্র শিল্পের জন্য শিল্পের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তিনি বলেছেন (সাহিত্যকে) সংজ্ঞা নির্দেশ করে অপরকে এর স্বরূপ বোঝানো যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা বোঝান যায়।' তাঁর কথা ছিল সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি এটির জন্ম বাস্তবতায়, বাইরের ঘটনা একে আংশিক প্রকাশ করে। সত্যকার যা ঐশ্বর্য সে চিরদিনই মানুষের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্ত বইয়ে বারবার ভূমিকার মতো তুলনামূলক সাহিত্যের প্রসঙ্গ এসেছে। আমরা মনে করি ওপরে সাজানো সাতটি তথ্য—চম্পূ শরৎ-সাহিত্য পড়া পড়ানোকে একটু ভিন্নখাতে বইয়ে দেওয়ার, শরৎচন্দ্রের আবেগী সত্তার অপনোদন করা সুবোধবাবুর বাসনার মধ্যে ছিল।

এর আগে তিনি লিখেছেন 'মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার'। আমরা শরৎ আলোচনাটি বেছে নিয়েছি এই কারণে যে বারবার শরৎ-সাহিত্য তাকে নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। দেখা যাক মধুসূদন নিয়ে আলোচনা কম না হলেও সুবোধবাবু কিভাবে তাঁকে দেখতে চান, জানতে চান। প্রথমে এসেছে মহাকাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্শণের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। আমরা যেখানে দুয়েক কথায় মহাকাব্য ব্যাখ্যান করি, সেখানে তিনি প্রাচীন মহাকাব্য সংজ্ঞা বিশ্লেষণের মর্ম বিচার করেছেন। এসেছে ইলিয়াডের কথা, ওডিসির কথাও। ফেয়ারি কুইনের কাহিনী ও চরিত্রগুলি কাল্পনিক বলে একে ঠিক মহাকাব্য বলা যায় না। কিভাবে প্রাচীন মহাকাব্যগুলির কাহিনীর বিস্তৃতি ও প্রত্যক্ষতা তৈরি হত, তা ব্যাখ্যা করেছেন। সুবোধবাবুর মনে হয়েছে যে সভাকবির কাব্য থেকে তা লোকসমাজে ছড়িয়ে যায়, কিংবদন্তী ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়ে।

মহাকাব্যের তাৎপর্যকে তিনি cosmic বা মহাজাগতিক আখ্যা দিয়েছেন। এখানে

এসেছে হ্যামলেট, কিংলীয়র, ওড টু দি ওয়েষ্ট উইন্ড-এর কথা। কিং লীয়র নাটক হলেও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। ব্যক্তির দুর্ভাগ্যকে ছাড়িয়ে তা জগতের বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। আবার শেলির কবিতার মধ্যে মহাজাগতিক পটভূমিকার জন্য তাকে মহাকাব্যের স্পর্শযুক্ত বলে মনে করেছেন। এরপর এসেছে নায়কের ব্যাখ্যান। হোমারের বর্ণনারীতির বৈশিষ্ট্য, টমাস হার্ডির আধুনিক মহাকাব্য, তাসো, মিলটন, প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গতিবোধ, জুপিটার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তুলনা আমাদের জানিয়েছেন।

প্রায় ৩৭ পৃষ্ঠা জুড়ে মহাকাব্যের স্বরূপ আলোচনা চলেছে। মেঘনাদবধ নিয়ে লেখকের আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকদের জানানো যেতে পারে—

১. মেঘনাদবধকাব্যের প্রকৃত বিষয় হচ্ছে আদর্শের বিরোধ এবং নিম্নস্তরের আদর্শের পরাজয়। মেঘনাদ-প্রমীলা আর্য আদর্শে চিত্রিত হয়েছেন।

২. মধুসূদন রাম-লক্ষ্মণকে ভীরু কাপুরুষ করেছেন, এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। মহাদেবকে লক্ষ্মণের উক্তি ভীরুর নয়। মধুসূদন হিন্দু দেবদেবীর ওপর সুবিচার করেন নি, একথাও ভুল। রাবণের তপস্যাকে 'ঘুমের নামান্তর' আখ্যা দিয়েছেন। রাবণ পরম শৈব হলেও সীতাহরণের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মীর আচরণে অসঙ্গতি নেই, বরং লঙ্কার দুর্ভাগ্যে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। করুণাঘন হৃদয়ে রাষ্ট্রের নিয়তিকে স্বীকার করেছেন।

৩. গীতিকবিতাগুলির বিস্তৃত উদাহরণের বিচারে তার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই।

৪. কৃষ্ণকুমারী তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক, ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির পুরোধার পক্ষে এটিই যথেষ্ট কৃতিত্ব। ব্যঙ্গ ও প্রহসনের পার্থক্য বুঝিয়ে মধুসূদনের প্রহসন দুটির আলোচনা করেছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'একেই কি বলে সভ্যতার থেকে উঁচুদরের প্রহসন। কোলরিজের কথা তুলে বলেছেন বিরোধী বস্তুগুলির একীকরণই কবিপ্রতিভার প্রধান লক্ষণ। মধুসূদনের প্রতিভার প্রধান গুণ এই যে তিনি সৌন্দর্যময় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সতত সজাগ ধর্মবোধের সমন্বয় করেছিলেন। এই দুটির আকর্ষণ-বিকর্ষণ তার কাব্যকে অপূর্বতা দান করেছে।

মধুসূদন নিয়ে অনন্ত আলোচনার প্রবাহ। তার মধ্যে সুবোধবাবুর ছোট বইটি আমাদের তুলনামূলক সাহিত্যপ্রবণতা এবং মধু-রচনার নূতন বিচারে উৎসাহিত করেছে মনে হয়।

তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' বইটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৩৪ নাগাদ ; আমরা পঞ্চম সংস্করণের পাঠ (১৩৭৭) নিচ্ছি সমালোচনার জন্য। প্রথমে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ওপর সুবিচারী-অবিচারী লেখার লেখক ও তাদের গুণ দোষ নিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রসমালোচনার অপূর্ণতা দেখেছেন তার ভাষাব্যবহারের আলোচনায়। কীটসের Endymion ও La Belle Dame Sans Merci-র যেমন দুরকমের কবিপ্রতিভার পরিচয় মেলে, তেমনি রবীন্দ্রকবিতারও পালাবদল আছে। সমালোচক শুধু কবির সূক্ষ্ম ভাব বা ভাবাংশের পরিচয় নেবেন তা হয় না। ভাষার বৈচিত্র্য ও উপযোগিতা এবং শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে তুলনাক্রমও

যুক্ত করতে হবে। কবির সমালোচনা সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ঋণ স্বীকার করেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী ও শিক্ষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এডওয়ার্ড টমসনের। 'গ্রন্থটির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ ও বিচার ; স্তুতি বা নিন্দা (রবীন্দ্রনাথ, ১ম সংস্করণ)।

চোদ্দটি অধ্যায়ে 'রবীন্দ্রনাথ' বিভক্ত—অবতরণিকা, প্রেমের কবিতা, স্বদেশ—নবীন ও প্রাচীন ভারত, প্রকৃতিগাথা, জীবনদোতা, শিশু, পলাতকা : লিপিকা : পুনশ্চ, রবীন্দ্রকাব্যে শেষ পর্যায়-১, শেষ পর্যায়-২, নাটক ও নাটিকা ; রূপক, ছোট গল্প, উপন্যাস, সাহিত্যতত্ত্ববিচারে রবীন্দ্রনাথ।

বইটি প্রায় সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার। সমস্ত বিষয় এই লেখায় ধরা যাবে না। তাই সমালোচনার চৌম্বক বিন্দুগুলি অনুভব করলাম :

১. 'প্রণয়ের সাধনাবেগ' ও 'প্রসাধনকলা', আশা-আকাঙ্ক্ষা, লজ্জা, তৃপ্তি ও তৃষ্ণা—কোন বিষয়কেই তিনি বাদ দেন নি। এগুলির প্রধান সুর সামান্যের মধ্যে অসামান্যের পরিকল্পনা, মানবীর মধ্যে মানসীর আবিষ্কার। সন্ধ্যাসংগীত থেকে মহুয়া পর্যন্ত প্রেমকাব্য সম্পর্কে এটি ভাববার মতো কথা।

২. জীবনদেবতা বিষয়ক কবিতার মধ্যে রহস্য সন্ধানের সঙ্গে প্রণয়ের আবেদন জড়িয়ে আছে। সোনার তরী ও নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবি নিজেকে অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। শেষ খেয়া ও খেয়া দেখি নির্ভরতা, একান্ত আশ্বাস। প্রথমে জীবনদেবতা অস্পষ্ট, রহস্যময়, পরে গীতাঞ্জলিতে তিনি তার ওপরে আস্থাবান হয়েছেন। পরিশেষ কাব্যেও তাকে পাই—কিন্তু সেখানে কবির বার্ধক্যের ছায়া পড়েছে।

৩. রবীন্দ্রনাটক সাংকেতিক। তার মধ্যে রূপকের ছোঁয়া আছে ; কিন্তু অরূপ, অসীমের সন্ধান তার প্রধান লক্ষ। ইয়েটসের উক্তি বিচারে রবীন্দ্ররূপকনাট্য আলোচনা এক নূতন মাত্রা এনেছে। রাজা নাটকে ঠাকুরদার চরিত্রের পরিণতির সঙ্গে ঘটনার সামঞ্জস্য নেই, নাটকীয় বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

৪. তিনসঙ্গী গল্পগ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো হল টেকনিক। একরাত্রি গল্পের সঙ্গে জর্জ এলিয়টের The Mill on the Floss-এর সাদৃশ্য তিনি খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি তার আলোচনায় নূতন মাত্রা পেয়েছে।

৫. ঘরে বাইরে যোগাযোগ শেষের কবিতা দুই বোনে ঘটনার চেয়ে ভাবের মূল্য বেশী। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, তা বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এসেছিল। গোরা উপন্যাসে দুটি জিনিসের মীমাংসা করতে হবে। এক, গোরার জন্ম দ্বিতীয় গোরার তর্ক ও আলোচনা। গোরার তর্কালোচনা সাহিত্যের মাত্রা মেনেছে কিনা সে প্রসঙ্গে সুবোধচন্দ্র বার্নাড শয়ের একটি মোক্ষম উক্তি উদ্ধার করেছেন : An allegory is never quite consistent except when it is written by some one without dramatic faculty in which case

it is unreadable there is only one way of dramatising idea ; and that is by treating one the stage a woman being possessed by that idea, yet none the less a human being with all the human impulses which make him ... and therefore interesting to us.

৬. সাহিত্যতত্ত্ব বিচারে রবীন্দ্রনাথ একটি অনবদ্য অধ্যায়। কারণ সুবোধবাবুও সাহিত্যতত্ত্ব সরসভাবে প্রয়োগ করেছেন তার অজস্র লেখায়। একটা core of literature খোঁজার ইচ্ছে তার সবসময়ই ছিল। এখানে অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সাহিত্য আবিষ্কার নয়, সৃষ্টি। কিন্তু এর প্রক্রিয়াকে তিনি অনাবরমস্বরূপ বলেছেন। তিনি সত্যকে এক বিশেষ স্বকীয় অর্থে ধরেছেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির স্থান কোথায়? সত্যকে তিনি হৃদয়মনীষা মনসা বলছেন। হৃদয় আর মন কি আলাদা? জীবন্ত মানুষকে ভ্রান্ত মতের চেয়ে চিরস্থায়ী করে রাখার কথা যা কবি লোকেন পালিতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেখানে জীবন্ত মানুষটিও কি একটি অবিচ্ছিন্ন পদার্থ বা অ্যাবস্ট্রাকশন? রবীন্দ্রসাহিত্যতত্ত্বে বাস্তবের সঙ্গে রসলোক কিংবা কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক স্পষ্ট হয় নি। অভিনবগুপ্তের মতানুসরণে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ণতা তিনি দেখিয়েছেন।

ধ্বন্যালোক ও লোচন অর্থাৎ আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্তের সাহিত্যতাত্ত্বিক রচনাবলীর বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় কালীপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সুবোধ সেনগুপ্ত যৌথভাবে রচনা করেন। এটির জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ আমাদের সংগ্রহে আছে। এখানেও তার গভীর অনুসন্ধ্যুৎসাহী মন কিভাবে what is literature and rhetoic খুঁজেছে, তার একটি পরিচয় পাই। ১৯৪৬ নাগাদ তিনি অতুল গুপ্তের কাব্যবিকাশ পড়ে কৌতূহলী হন। চল্লিশ বছর পরে আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত বিশ্লেষিত ধ্বনিবাদ তাঁকে কৌতূহলী করে তোলে। এই ধরনের জটিল কূটতাত্ত্বিক সাহিত্যমীমাংসায় যে অসাধারণ উজ্জ্বলতা ও একাগ্র পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। দুই সম্পাদক তা সযত্নে পালন করেছেন। সুবোধচন্দ্রের সমালোচনাসত্তা য়ুরোপীয় কাঠামোয় অনিয়ম হলেও স্বদেশের চিত্তানুশীলনকে আজকের মতো একপাশে সরিয়ে দেয় নি, এটি তারই প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত হল। তার আর বইয়ের আলোচনা করে সম্পাদকীয় তাড়না এড়িয়ে যেতে পারি। আসলে বাংলা সমালোচনাপ্রবন্ধ ঠিকমতো পাওয়া যায় না নানা কারণে—

(১) সম্পাদকীয় সময়ের ফরমান (২) সম্পাদকীয় বহরের (কত পৃষ্ঠা) পরিমাণ (৩) অনধিকারীর চর্চা (৪) সম্পাদকীয় দয়ার দান বলতে কিছু নেই (৫) নিজের মেধা, পরিশ্রমকে এই অনাহারী শাখাতে বিনিয়োগকারীরা খাটাবেন কেন? আমাদের এই প্রবন্ধে হয়তো যে কোনো একটা কারণ ক্রিয়াশীল। তা অনুক্ত রেখেই বাকি আলোচনা শেষ করছি দ্রুত ছাপার এবং পরিবেশন কাজে সাহায্যের জন্য।

সুবোধ সেনগুপ্তের 'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) আবার

শরৎসাহিত্যকে ফিরে দেখার প্রয়াস। এখানে উৎসর্গপত্রের অংশ থেকে জানা যাচ্ছে শরৎসাহিত্য সমালোচনা এবং রবীন্দ্রকাব্যপাঠের স্মৃতিময়তা তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যরসিক, বিদগ্ধ, অগ্রজপ্রতিম প্রয়াত সেই বন্ধুর সূত্রে সুবোধবাবু শরৎ-সমালোচনা শুরু করেছিলেন, তাকেই উৎসর্গ করলেন শরৎ-সমালোচনার পরিসমাপ্তি গ্রন্থ।

এখানে তিনটি অংশ আছে। (১) শরৎচন্দ্রের জীবনের বিবরণী—প্রামাণ্য জীবনী রচনা করতে চান নি। (২) শরৎসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ও প্রতিভার ক্রমবিবরণ। যদিও শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'In Bengal, I am the only writer who has not had to struggle'। বিষয়ের বৈচিত্র্য, শিল্পকলা, জটিলতা ও ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শরৎসাহিত্য বিশ্লেষিত (৩) শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনের রূপরেখা।

লেখকের জীবনীর সঙ্গে তার সৃষ্টিপ্রবাহের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বলা কঠিন। শেক্সপীয়রের জীবন অনেকটা জানা গেলেও তার থেকে তাঁর সৃষ্টির পরিচয় পাই না। ব্রাউনিং বলেছিলেন যে নৈর্ব্যক্তিকতার জন্যই শেক্সপীয়র জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর সমকক্ষ কবি দান্তে সোজাসুজি নিজের আকাঙ্ক্ষা, কামনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। শরৎজীবনীতে তার চেনা মানুষরা যে সবসময় সাহিত্যে রূপ পেয়েছেন, তা নয়। যেমন শেক্সপীয়রের জীবনীকার ই. কে. চেম্বার্লি বলেছেন যে one cannot be expected to ... whether Lord Buckharst was or who not Sir Toby Belch'। শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রকাশের ব্যাখ্যা যারা করেছেন, তারা শরৎচন্দ্রকে প্রবাসে দেখেন নি কিংবা তাঁর জীবিতকালে মুখ খোলেন নি। নিজে তিনি তথ্যভারাক্রান্ত আত্মজীবনী লেখেন নি। নিজের অসুস্থতা জরা নিয়ে চল্লিশে পৌঁছে বার্ধক্যের রসিকতা করেছেন, কিন্তু নিজের জীবনী লেখেন নি। হয়তো তিনি মনে করতেন লেখার চেয়ে না লেখার আর্ট বড়ো।

পিতা মতিলাল বছর তিনেক ছাড়া কোনো উপার্জন করতে পারেন নি। ফলে শরতের স্কুলের মাইনে বাকি থাকত। শরৎচন্দ্র লেখাপড়া ছাড়লেন পরে ভাগলপুরে মতিলাল যাওয়াতে তার পড়াশোনা শুরু হয় কলেজিয়েট স্কুলে। কিন্তু টাকার অভাবে এফ. এ. পরীক্ষায় বসতে পারেন নি। সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি ছাড়লেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুসংবাদে আবার ফিরলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে মামাবাড়িতে আশ্রয় নিলেন। এই হল জীবনের প্রথম পর্ব। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই শরৎচন্দ্র তার ছেলেবেলা, প্রথম যৌবন কাটিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র-নিরুপমা দেবীর সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যার, প্রণয়কল্পনা কেউ কেউ করেছেন। বরং সুবোধবাবু একে শেক্সপীয়রীয় ভাষায় বলেছেন তাদের সম্পর্ক ছিল marriage of true minds'। যৌবনে তিনি ছিলেন বেপরোয়া, ভবঘুরে যারা সোজা পথে চলে না, গোঁড়ামির বিরোধী। ছয়শ কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করে তিনি 'নারীর ইতিহাস' লিখেছেন। চরিত্রহীন উপন্যাসে সুরবালা, শেষপ্রশ্নে অক্ষয়ের স্ত্রীর চরিত্রে নিজের স্ত্রী হিরণ্ময়ীর ছায়া আছে।

শরৎচন্দ্র দার্শনিকের দাবী করেন নি বরং সাহিত্যিক বলে নিজেকে মনে করেছেন।

জমিদারী প্রথা, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কাম্য হলেও প্রতিপদে তা সঙ্কুচিত হয় এবং আপসকামিতার ব্যক্তিজীবন সার্থক হয়ে ওঠে। সব্যসাচী কিংবা শেষ প্রশ্নের কমল স্বাধীনতার পথিক হলেও একই ধরনের বাধার মুখোমুখি হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে উপসংহারে মিডিয়া, ক্লাইটেমেনেস্ট্রার মধ্যে সাধারণ নারীর মনোবৃত্তি সুবোধবাবু লক্ষ করেছেন, আবার নোরা, এমাশেভারী'র মতো সাধারণ নারী মহাকাব্যোপম বিশালতা পেয়েছে। শরৎসাহিত্য এই সাধারণ এবং অসাধারণের মিলনের সাক্ষ্য বহন করে। এখানেই তার বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে লিখেছেন : (প্রেমের) আনন্দ ও বেদনা, কালিমা ও বিশুদ্ধতা, সংঘাত ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া তিনি প্রেমের 'অমৃত মূরতি' গড়িয়াছেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তার এই শেষ প্রশ্নে অনেকগুলি সূত্র আছে যা ধরে শরৎসাহিত্যের পুনর্বিচার এখনও প্রাসঙ্গিকতা পেতে পারে। পরবর্তী রচনা হল 'হাস্যরসিক পরশুরাম' (বৈশাখ, ১৩৮৬)। এটি পরমবন্ধু প্রয়াত স্বাধীনতাসংগ্রামী সাহিত্যপ্রেমিক হাস্যরসজিজ্ঞাসু সুরেশচন্দ্র দে-কে উৎসর্গ করেছিলেন।

বিজ্ঞানের ছাত্র, ব্যবসায়ের সকল কর্ণধার রাজশেখর বসু প্রৌঢ় বয়সে 'পরশুরাম' নাম নিয়ে গড্ডালিকা ও কজ্জলী প্রকাশ করে অসামান্য প্রতিষ্ঠা পান সাহিত্যের জগতে। কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনা আছে। ফলে পরের ছোটগল্পগুলি সমাদর পায় নি। অথচ সংহতি, চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং গভীরতা এসব গল্পে বিদ্রূপ ও কৌতুকের মধ্য দিয়ে জীবনরহস্যকে ধরতে চেয়েছে। রোমান্সকেও তিনি অবহেলা করেন নি। এখানে ব্যঙ্গকৌতুক থাকলেও উচ্চহাস্য (role of laughter) নেই।

এই রচনাটির একটু ইতিহাস আছে। লেখক হৃদরোগী হয়ে যখন পরশুরাম পড়ার ছাড়পত্র পেলেন, তখন নাতির কাছে তা শুনতেন। কারণ তার নিজের পঠনপাঠন নিষিদ্ধ ছিল। পরে নিজে গল্পগুলি পড়েন। কিন্তু নাতি অংশুমানের পঠনপাঠন তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। সুবোধবাবু মজা করে বলেছেন যে হৃদরোগাক্রান্ত মানুষকে ওষুধ দেওয়া হলেও পরশুরাম গল্পপাঠের ব্যবস্থা করলে সুফল পাওয়া যাবে।

বইটি ছটি অংশে বিভক্ত—উপক্রমণিকা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, পৌরাণিকা, রোমান্স ও রসিকতা, লম্বকর্ন-কেদার চাটুজ্যে—জটাধর বকশী।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পরশুরামের সংস্কারজীব, উদ্দেশ্যহীন মনে করেছেন তা তার ছাত্র সুবোধচন্দ্র মেনে নেন নি। ডন কিহোতের প্রসঙ্গ বলেছেন হাসির সঙ্গে কারুণ্যের মিশ্রণের কথা। এসেছে বার্নার্ড শ থেকে মশিয়ের, রাবলে, আরিস্ত কেনিকের কথা। এরপর E.M. Forster-এর চরিত্র বিভাজন মনে করিয়েছেন Aspect of Novel থেকে। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত ভাল করে পড়ে অনুবাদও করেছিলেন পরশুরাম। কাহিনীর কোনো পরিবর্তন করেন নি বরং মূলানুগ অনুবাদও অন্বয় বজায় রেছেছেন। পরশুরামের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পরিমিতিবোধ, কাণ্ডজ্ঞান ও বাস্তবমুখিনতা। চিকিৎসাশাস্ত্র তার ব্যবসায়িক প্রয়োগ এবং মুদ্রাদোষ নিয়ে লিখলেও এর আড়ালের অসঙ্গতিকে স্পর্শ করতে পারেন নি। কতকগুলি গল্পের বিষয় হল সামাজিক অসাধুতা,

কালোবাজারি, চোরাকারবারীর প্রতি কশাঘাত। জোনাথন সুইসটের বিশ্বনিন্দুককার প্রসঙ্গ এসেছে 'ধনুমামার হাসি' গল্পে। আশ্চর্যের ব্যাপার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরশুরামের নির্দিষ্ট কয়েকটি গল্পই ঘুরে ফিরে আসে, বাকি লেখাগুলো কোনোদিনই পাঠোচিত মনে হয়নি। অথচ সমালোচক তার মধ্যে সুইফটসুলভ নিন্দার বিষয় লক্ষ করেছেন। উক্তি ইঙ্গিতের যে তাৎপর্যময়তা এখানে আছে, তা পরশুরামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে মেলে ধরে।

পরশুরামের ওপর অনেক আলোচনা হলেও লেখকের এই বইটিতে পাঠকের গল্পপাঠের অভিমুখ কেন পালটানো উচিত এবং স্বল্পালোচিত গল্পগুলির অনবদ্যতা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পরশুরাম বা রাজশেখর বসুর লেখকসত্তার নূতন পরিচয়ে ঋদ্ধ হলাম।

আলোচনার সমাপ্তি ঘটবে তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশ করে। ১৩৯৪ সালে লেখক লিখছেন পঞ্চাশ বছর আগে এটি লেখা এবং পুনর্মুদ্রিত হলেও ১৯৮৩-তে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ পড়ে তার মনে হয় ঐ রচনাটির পুনর্বর্ধন করা প্রয়োজন।

এখানে তার লেখা আটটি অংশে গ্রথিত হয়েছে—(১) বঙ্কিমতত্ত্ব ও সৌন্দর্যসৃষ্টি (২) উপন্যাস-রোমান্স-রূপকথা : বঙ্কিমী রীতি (৩) গঠনকৌশল — বঙ্কিমী রীতি (৪) দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনী-বিষবৃক্ষ (৫) চন্দ্রশেখর-রজনী-কৃষ্ণকান্তের উইল - রাজসিংহ-উপকথা (৬) আনন্দমঠ (৭) দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম (৮) কমলাকান্তের দপ্তর-মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত-লোকরহস্য এবং পরিশিষ্ট : Rajmohans wife'.

সাহিত্যে বঙ্কিম দুটি জিনিসের অনুসন্ধান করেছেন—বিশ্বের বৈচিত্র্যের আড়ালে ঐক্যের আবিষ্কার এবং প্রত্যক্ষ জগতের রূপের উন্নয়ন করা। ঠিক এই দুই দিক থেকে বঙ্কিমপ্রতিভাকে আমরা বিচার করেছি বলে মনে পড়ছে না। সমস্ত রচনায় সুবোধবাবু এক প্রবল সাহিত্যবোধ এবং তত্ত্বভারবিহীন মনস্কতায় বঙ্কিমের পুর্নর্বিচারে আমাদের উৎসাহিত করেন। যদিও এই রচনা সম্পর্কে একালে আমাদের আগ্রহ আছে বলে দেখি না।

একদম উপান্তে এসে সুবোধবাবুর সমালোচকসত্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হাজির করব :

১. তিনি যেভাবে আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে সাহিত্যতত্ত্ব, তুলনামূলক সাহিত্য সবসময়ই প্রকাশ্যে না এলেও প্রচ্ছন্নরূপ ধারণ করেছে।

২. পাঠক এবং লেখকের সমকালে যেসব ভুল ধারণা আছে, তাকেও ছিন্নভিন্ন করে নিজের কথাটা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ স্বকীয়তা তার সমালোচনার বিশিষ্ট সুর।

৩. ভাষাভঙ্গি সবসময় চলিতের পথ না ধরলেও সাধু ভাষাতেও পরস্পর-স্পর্ধিত রমণীয় বাক্যমালার সাহায্যে নিজের ভাব প্রকাশ করেছেন।

৪. বাংলার চারজন বিখ্যাত লেখক নিয়ে (বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, পরশুরাম) নিজের সাহিত্যাদর্শ ও সমালোচনার বেষ্টনীটি স্পষ্ট করেছেন।

৫. যখন লিখেছেন তখন এখনকার তুলনামূলক সাহিত্যের পঠনপাঠন শুরু হয় নি।

অথচ সাহিত্যের সমালোচনাবিন্দুতে তুলনা-প্রতিতুলনা যুক্ত করেছেন। আমাদের পাঠ্য চেতনার গণ্ডি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

৬. ইংরেজির প্রথিতযশা শিক্ষক হয়েও একালের উন্নাসিকতা তার ছিল না। বাংলা, সংস্কৃত দুটি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। চেয়েছিলেন প্রাচ্যের মনীষার সঙ্গে প্রতীচ্য ভাবনালোকের একটা সহনশীল অবস্থান তৈরি হোক।

৭. যে কোনো আলোচনার সময় সাহিত্যতত্ত্বকে সঙ্গী করলেও তার মধ্যে পণ্ডিতমন্নতা কিংবা দেখনদারি ছিল না আমাদের মতো। বরং সাহিত্যতত্ত্বের মৌল কথাগুলি কিভাবে সমালোচকের জীবনে ওতঃপ্রোত হয়ে যায়, তার পরিচয় আমরা ওনার রচনায় পাই।

বাংলায় অনেক রচনাবলী বের হয়। সুবোধবাবুর বইগুলি ক্রমে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। যদি আমরা তাঁর ইংরেজি রচনা এবং বাংলা রচনার দুটি খণ্ড সংকলন করতাম, তাহলে জগতের কোনো ক্ষতি হত না বলেই মনে করি।